Vol. 6 | No. 1 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

Volume	6
Issue	1
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্
Published online	June 15, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i1.2
Pages	35-60
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্

বিভিন্ন "লোকালয়" ও স্বর্গ-নরকাদি প্রতিফলের স্থান

জগৎকে "লোক" বলা হয়। উত্তম, অধম ও মধ্যম, এই তিন প্রাথমিক শ্রেণীতে "লোক"গুলি বিভক্ত। সর্বোচ্চ জগতের নাম "স্বরলোক", অর্থাৎ স্বর্গ। নিম্নতম জগৎ হচ্ছে "নাগলোক", অর্থাৎ সর্পরাজ্য। আসলে এটি নরক। একে আবার "নাশ লোক" (?) আর কখনও কখনও 'পাতাল"ও বলা হয়। এই দুইএর মধ্যবর্তী যে জগৎ, যার মধ্যে আমরা বাস করি, তার নাম "মাদলোক" (? মধ্যলোক, মর্ত্যলোক ?) কিংবা, "মনুষ্যলোক" অর্থাৎ মানবজগৎ। শেষোক্ত জগৎ মানুষের পুণ্য অর্জন করার জন্য আর সর্বোচ্চ লোক তার প্রতিফল পাবার স্থান। নিম্নতম লোক তার শাস্তির জন্য ধার্য। যে স্বর্গ বা নরকের যোগ্য হয় সে তার কর্মকালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তার ফল ভোগ করতে থাকে, কিন্তু এই দুই লোকের যে লোকেই সে থাকুক না কেন, দেহমুক্ত আত্মারূপেই সে থাকে, আর যার স্বর্গে যাবার অধিকার হয়নি অথচ নরকের শাস্তিও যার প্রাপ্য নয়, তার জন্য আর একটি জগৎ আছে যার নাম "তির্যক লোক", অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি-হীন পশু ও বৃক্ষাদির জগৎ এই জগতের নিম্নতম প্রাণী থেকে জন্মান্তর আরম্ভ করে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গুণ-সম্পন্ন মনুষ্য-জীবনের দিকে আরোহণ করতে হয়। এই "তির্যক লোকে" আত্মাকে বাস করতে হয়, হয় তার কর্মফল স্বর্গ বা নরক যাবার জন্য যথেষ্ট নয় বলে, নয়তো নরক থেকে সে প্রত্যাবর্তন করেছে বলে। কারণ এদের মতে আত্মা যদি স্বর্গ থেকে মর্তে আসে তাহলে মানব রূপেই সে আসে, কিন্তু নরক থেকে এলে তাকে প্রথমে বৃক্ষ ও পশু দেহে বিচরণ করে মানবদেহ ধারণের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

হিন্দুদের 'পুরাণে' বহু সংখ্যক নরক, তার গুণাগুণ ও নামের বর্ণনা আছে। প্রত্যেক পাপের জন্য পৃথক নরকের ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণুপুরাণ-অনুযায়ী নরকের সংখ্যা হচ্ছে ৮৮ হাজার। এই পুস্তক থেকে আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃতি করছি।

''যে 'মিথ্যা দাবী করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় আর যে এরূপ কর্মে সহায়তা করে এবং যে অন্যকে উপহাস করে, তারা সব 'রৌরব' নরকে যাবে।

যে নির্দোষীকে হত্যা করে, যে পরস্বাপহরণ করে, যে অপরকে লুণ্ঠন করে, যে গো-হত্যা করে, তাদের 'রূধো' নামক নরকে স্থান হবে। যারা শ্বাসরোধ করে প্রাণীহত্যা করে তারাও এই নরকে যাবে।

যে ব্রাহ্মণ-হত্যা করে, যে স্বর্ণ চুরি করে, যে তার সাহচর্য করে, যে রাজা প্রজাপীড়ন করে, যে গুরুপত্নী-গমন করে কিংবা শাশুড়ীতে উপগত হয়, তাদের জন্য 'তপ্তকুণ্ড' নামক নরক আছে।

লোভের বশে যে নিজ স্ত্রীর ব্যভিচারকে উপেক্ষা করে, যে নিজ কন্যা বা পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, যে নিজ সন্তান বিক্রয় করে কিংবা ধনরক্ষার জন্য যে নিজের প্রতিও কৃপণতা করে, তারা 'মহাজ্বালা' নামক নরকে পতিত হবে।

যে গুরুকে অসম্মান করে ও তার প্রতি অপ্রসন্ন থাকে, যে মানুষকে অবজ্ঞা করে, পশুগমন করে, যে বেদপুরাণাদিকে উপহাস করে কিংবা তদ্দ্বারা পণ্যশালায় জীবিকা অর্জন করে, তারা সব 'সবল' নরকে যাবে।

তস্কর, ঠগ, যে মানুষের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, যে নিজ পিতার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, যে ঈশ্বর বা মানুষ কাউকেই ভালবাসে না, বিধাতা যে সব রত্নকে মহার্ঘ করে সৃষ্টি করেছেন, তাদের সম্মান না করে যে লোক সেগুলিকে সাধারণ প্রস্তরবৎ মনে করে, তাদের স্থান 'কিরমিশ্' নরকে।

যে জনক জননী বা পূর্ব পুরুষদের অধিকার উপেক্ষা করে, যে দেবতাদের প্রতি কর্তব্য পালনে উপেক্ষা করে, যে বাণ ও বর্ষা-ফলক নির্মাণ করে, তারা সব 'লারাপক্ষ' (? 'লালাভক্ষ') নামক নরকে বাস করবে।

তরবারি ও ছুরিকা নির্মাতারা 'বিষাসন' নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাজার প্রাপ্য না দেবার জন্য লোভের বশবর্তী হয়ে যে স্বীয় ধন গোপন করে, যে ব্রাহ্মণ হয়ে মাংস, তৈল ঘৃত ও অগ্নিপক্ক ব্যঞ্জন বা মদ্য বিক্রয় করে, তাদের জন্য 'অধোমুখ' নরকের বিধান আছে।

যে কুক্কুট, মার্জার, মেষ, শুকর ও পক্ষী পালন করে সে 'রুধীরান্ধ' নরকে যাবে।

হাট বাজারে যারা ক্রীড়া কৌতুক ও গীত বাদ্য করে বেড়ায়, জল উত্তোলনের জন্য যে কূপ খনন করে, পূজার দিনে যে স্ত্রী-সংসর্গ করে, লোকের গৃহে যে অগ্নি সংযোগ করে, যে বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও তার ধনের লোভে বন্ধুকে পুনর্গ্রহণ করে, তাদের বাস 'রৌদ্র' (?'রুধীর'?) নরকে হবে।

যে মধুচক্র থেকে মধু আহরণ করে সে 'বৈতরণে' (?) যাবে।

যৌবনমদে মত্ত হয়ে যে অন্যের ধন বা স্ত্রী লুণ্ঠন করে, তার স্থান হবে 'কৃষ্ণ' নরকে।

বৃক্ষ কর্তনকারী 'আসিপত্রবনে' যাবে।

ব্যাধ ও পশু-পক্ষী ধরার ফাঁদ নির্মাতা 'বহ্নি-জ্বালা' নরকে যাবে।

সামাজিক আচার ও রীতিকে যে অবহেলা করে এবং যে ধর্মের বিধান অমান্য করে—পাপীদের মধ্যে এই সর্বনিকৃষ্ট,—সে 'সংদংশক' নরকে যাবে।"

এই তালিকা আমরা এইজন্য দিলাম যে হিন্দুরা কোন্ কোন্ কার্যকে পাপ মনে করে তা বোঝা যাবে।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে পুণ্যার্জনের এই মধ্যবর্তী জগৎই মনুষ্যলোক এবং এখানে মানুষ বিচরণ করে এই কারণে, যে তার কর্মফল তাকে স্বর্গারোহণ বা নরকলোক কোনটারই যোগ্য করেনি। তাদের মতে, স্বর্গ এক উচ্চ স্তরের জগৎ; আত্মা সেখানে যে আনন্দ ভোগ করে সে আনন্দের স্থিতিকাল তার সৎকর্মের অনুপাতে নির্দিষ্ট হয়। তেমনি শাস্তি হিসাবে, পশু বৃক্ষাদি ইতর প্রাণীর মধ্যে বিচরণ করার স্থিতিকালও তার দুষ্কর্মের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়। এদের মতে, মানবশ্রেণী থেকে অধঃপতিত হওয়া ছাড়া নরকের অন্য কোনরূপ নাই।

মানুষকে এই সব পরিণাম এই জন্য ভোগ করতে হয় যে বন্ধন মোচনের এমন কোন সরল পথ নাই যা তাকে নিশ্চিত প্রজ্ঞার দিকে নিয়ে যেতে পারে। নিজে অনুমান করে বা অন্যের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করেই, সে পথের

সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কর্মই, এমনকি, মানুষের শেষ কৃতকর্মও, কখনও বিফলে যায় না, তার অর্জিত পাপপুন্যের পারস্পরিক ওজন নিরূপিত হওয়ার পরও তা গণনা করা হয়। কিন্তু কর্মের প্রতিফল, কর্মের উদ্দেশ্য অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সে প্রতিফল, হয় তার বর্তমান জন্মে, নয়তো তার পরজন্মের দেহে, কিংবা তার দেহত্যাগ ও পুনরায় দেহ ধারণের মধ্যবর্তী অবস্থাতেই সে পায়।

এই পর্যন্ত এসে হিন্দুরা দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে, শ্রুতি ও কিংবদন্তীর দিকে চলে যায়। শাস্তি ও পুরস্কারের স্থানদুটির বর্ণনা প্রসঙ্গে ওরা বলে যে, এই দুইটি স্থানে মানুষ কায়াহীন অবস্থায় থাকে, এবং কর্মফল পাওয়ার পর সে আবার দেহ ধারণ করে বিধিনির্দিষ্ট অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে মানবজীবনে প্রত্যাবর্তন করে। এই জন্য 'সাংখ্য' গ্রন্থের লেখক স্বর্গলাভের পুরস্কারকে মঙ্গল বা পরম কাম্য বলে মনে করে না, কারণ স্বর্গবাস স্থায়ী নয়, তারও শেষ আছে, এবং স্বর্গের জীবনের সঙ্গে পৃথিবীর জীবনের সাদৃশ্য আছে, কেননা সেখানেও অহঙ্কার ও ঈর্ষার রেশ থাকে এবং স্বর্গীয় অস্তিত্বের ও মর্যাদারও শ্রেণীভেদ আছে অথচ পূর্ণ সাম্য না হলে লোভ ও ঈর্ষা কখনও দূর হয় না।

সুফী সাধকরাও স্বর্গবাসকে অন্য কারণে শুভ বা কাম্য মনে করেনা, তার কারণ স্বর্গে পরম সত্য (আল্লাহ) কে ছেড়ে আত্মা অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট ও তৃপ্ত হয়, এবং চরম মঙ্গলস্বরূপ (অর্থাৎ আল্লাহ) ছাড়া অন্য বস্তুতে নিবিষ্ট হয়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে হিন্দুদের ধারণামতে, দেহহীন অবস্থায় আত্মা স্বর্গ ও নরকে বাস করে। এই ধারণাটি কিন্তু ওদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের, যারা আত্মাকে স্বয়ম্ভু মনে করে। কিন্তু যারা নিম্নশ্রেণীর লোক, দেহ ব্যতিরেকে আত্মার কল্পনা যারা করতে পারে না, আত্মা সম্বন্ধে তারা নানারূপ ধারণা পোষণ করে। একদল মনে করে যে নির্মীয়মান নূতন অবয়বের জন্য আত্মার প্রতীক্ষাই মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার কারণ। যতক্ষণ না অনুরূপ ক্রিয়াগুণ-সম্পন্ন কোন সগোত্র জীবের উন্মেষ হয়, ততক্ষণ আত্মা দেহ থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রকৃতির নিয়মে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বা মৃত্তিকা গর্ভে বীজরূপে যেসব জীবনের সূচনা হয়, সেইরূপ কোন জীবের সৃষ্টি হলেই তবে আত্মা তার পূর্বদেহ ত্যাগ করে।

আর একদল কিন্তু প্রচলিত মতানুযায়ী বলে যে আত্মা নূতন অবয়বের জন্য অপেক্ষা করে না; পঞ্চভূত থেকে তার জন্য আর একটি আকৃতি প্রস্তুত

হলেই পুরাতন দেহের জীর্ণতাহেতু, আত্মা সে দেহ ত্যাগ করে। এই নূতন অবয়বকে 'অতিবাহিকা' বলা হয়, অর্থাৎ দ্রুতনির্মিত সত্তা। এই নামকরণের হেতু এই যে, এই অবয়বের সৃষ্টি জন্মের প্রক্রিয়ায় হয় না। এই দেহের মধ্যে আত্মা পূর্ণ বৎসরকাল নিরতিশয় যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করে; সে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য হোক বা না হোক।

এ অবস্থাটি 'বরজখের' মত, যা পারসীকরা কর্ম ও কর্মফল-প্রাপ্তির মধ্যবর্তী অবস্থাকে বলে। এইজন্য হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী মৃতের উত্তরাধিকারীকে তার সংবাৎসরিক অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মাদি পালন করতে হয়। বৎসরান্তে এই অনুষ্ঠানাদি শেষ হয়, কারণ তখন আত্মা তার নির্দিষ্টস্থানে চলে যায়।

আমার এই কথার প্রমাণ হিসাবে, হিন্দু গ্রন্থাদি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেব।

বিষ্ণু পুরাণে আছে: "নরক ও শাস্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর করলেন: এর উদ্দেশ্য হল ভাল ও মন্দ, জ্ঞান ও অজ্ঞানতার পার্থক্য বিধান এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। পাপী মাত্রেই 'নরকে' যাবে তা নয়। তাদের কেউ কেউ জীবদ্দশায় অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নরক ভোগ থেকে অব্যাহতি পায়। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হল প্রত্যেক কর্মে বিষ্ণু নাম স্মরণ করা। পাপীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার লতাবৃক্ষ, ইতর কীট পতঙ্গ, উকুন কেঁচোর মত ঘৃণ্য সরীসৃপের মধ্যে তার কর্মানুযায়ী নির্দিষ্টকাল ধরে বিচরণ করবে।"

'সাংখ্য' পুস্তকে আছে: "যে উন্নয়ন ও সুফলের অধিকারী হয়, সে দেবতার মর্যাদা প্রাপ্ত হয়, দেবাত্মাদের সাথে সে মেলা-মেশা করে, আকাশমণ্ডলের অধিবাসীদের বা অষ্ট প্রকারের অশরীরী আত্মাদের মত হয়ে সে সেখানে অবাধে বাস ও বিচরণ করে। আর পাপ ও দুষ্কর্মের জন্য যে অধঃপতনের যোগ্য হয়, সে পশু বা বৃক্ষে পরিণত হয় এবং পুরস্কারযোগ্য হয়ে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় সে বিচরণ করতে থাকে। আত্মাদান করে দেহরূপী বাহনকে পরিত্যাগ করতে পারলে তবে তার মুক্তিলাভ হয়।"

জন্মান্তরবাদের প্রতি আকৃষ্ট কোনও এক (মুসলমান) ধর্মশাস্ত্রবিদ্ (মুতাকাল্লেমীন) বলেছেন: "আত্মার পরিক্রমণের চারটি স্তর আছে। এক

দেহান্তর (نسخ) ; এ স্তর মনুষ্যজন্মে সীমাবদ্ধ, কেননা জন্ম প্রক্রিয়ার দ্বারাই এক ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তিতে জীবন সঞ্চারিত হয়। এর বিপরীত স্তর হোল, দুই : বিকৃতি ; এ স্তরও বিশেষ করে মানুষ সম্বন্ধে-ই প্রযোজ্য, কারণ মানুষ-ই বানর শুকর, হস্তী ইত্যাদিতে পরিণত হয়। তিন, উদ্ভিদের মত স্থানুত্ব। এ স্তর বিকৃতির চেয়েও কষ্টকর, কারণ এ অবস্থা অনন্তকাল ধরে পর্বতের মত স্থায়ী হয়। এর আবার বিপরীত দশা হোল : চার, অবলুপ্তি। এ দশা মূলোৎপাটিত বা কর্তিত উদ্ভিদ ও বলির পশুর হয়, কারণ এগুলি নিশ্চিহ্ন হবার সময়ে কোনও জের বা বংশ রেখে যায় না।"

আবু ইয়াকুব সিযজি তাঁর 'কাশফুল মাহযুব', নামক পুস্তকে বলতে চেয়েছেন যে, জীবজগতের কোনও প্রজাতি কখনও লোপ পায়না এবং জন্মান্তর এক প্রজাতির মধ্যেই হতে থাকে, কোনও প্রাণী তার প্রজাতি অতিক্রম করে অন্য প্রজাতিতে জন্মান্তরিত হয় না।

প্রাচীন ইউনানীদেরও এইরূপ ধারণা ছিল। (Johannes Grammaticus) বৈয়াকরণিক ইয়াহ্ইয়া প্লেটোর মত উদ্ধৃত করেছেন যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব পশুদেহে আবৃত হবে। ইয়াহ্ইয়া মন্তব্য করেছেন যে এই ব্যাপারে প্লেটো Pythagoras এর উদ্ভট গালগল্পের প্রতিধ্বনি করেছেন।

Phaedo (فاذن) নামক গ্রন্থে সক্রেটিস বলছেন : "দেহ পার্থিব, মৃন্ময়, গুরুভার ও স্থূল। দেহাসক্ত ভ্রাম্যমান আত্মা নিরবয়বের ভয়ে ও Hades (আত্মার সমাগমের স্থান) এর আতঙ্কে যে স্থান দেখে তাতেই সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখন আত্মা মলিন হয়ে যায় এবং কবর ও সমাধি ক্ষেত্রে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এই সব স্থানেই ছায়ারূপে আত্মাকে আবির্ভূত হতে দেখা গিয়েছে। এই ছায়ারূপ ধারণ সেই সব আত্মারই হয় যাদের বন্ধন মোচন সম্পূর্ণ হয় নি, যাদের মধ্যে তাদের প্রিয় বস্তুর এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।"

সক্রেটিস আরও বলেছেন : "এগুলি সৎলোকের আত্মা বলে মনে হয় না। এগুলি দুষ্টলোকের আত্মা, যারা এই সব বস্তুর মধ্যে বিচরণ করে তাদের পূর্বের কুশিক্ষার প্রায়শ্চিত্ত করে। দেহ ধারণের যে কামনা তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তার দরুন কোনও দেহের সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এই অবস্থাতেই থাকে। পৃথিবীতে থাকাকালে তাদের যে বয়স চরিত্র ছিল, সেইরূপ চরিত্র-

সম্পন্ন দেহতেই তারা বাস করবে। যেমন পান ও ভোজন ছাড়া যে আর কিছু জানে না, সে বিভিন্ন প্রকারের বলিবর্দ ও হিংস্র পশুর দেহে প্রবিষ্ট হবে ; যে উৎপীড়ন ও অবিচারকে উত্তম জ্ঞান করেছে সে নেকড়ে বাঘ, শ্যেন ও বাজপক্ষীর দেহ প্রাপ্ত হবে।"

মৃত্যুর পর আত্মার সমাগম স্থানগুলি সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন : "যদি আমি না মনে করতাম যে সর্বপ্রথমে আমি প্রাজ্ঞ, মুখ্য ও মহৎ দেবতাদের কাছে যাব এবং তারপরে সেইসব মৃত মানবাত্মার কাছে যাব, সততায় যারা এখানকার মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে মৃত্যুর জন্য শোকার্ত না হওয়া আমার অন্যায় হোত।"

পুরস্কার ও শাস্তির স্থানদুটি সম্পর্কে প্লেটো বলেছেন : "মানুষের মৃত্যু হলে Daimon নামক নরক-প্রহরীদের একজন তাকে বিচারস্থলে নিয়ে যায়, আর ভারপ্রাপ্ত, আর একজন অন্যান্য আত্মার সাথে তাকে পথ দেখিয়ে Hadesএ নিয়ে আসে। সেখানে সে বিধিনির্দিষ্ট সংখ্যার দীর্ঘ কালচক্র অতিবাহিত করতে থাকে।" Telephos বলেন : "Hadesএ যাবার পথ সমতল।" আমি বলি, "Hadesএ যাবার পথ যদি একটিমাত্র কিম্বা সমতলই হবে, তাহলে পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক হোত না। যে আত্মার দেহকামনা আছে, কিম্বা যে দুষ্কর্ম ও অন্যায়াচরণ করেছে এবং হত্যাকারীর আত্মার সাথে যার সাদৃশ্য আছে, সে Hades থেকে পলায়ন করে প্রত্যেক প্রজাতির দেহে নিজকে আবৃত করতে থাকে। এইভাবে কিছু কাল কাটে। অবশেষে বাধ্যতামূলকভাবে তাকে তার যোগ্য স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। আর যে আত্মাগুলি পবিত্র, তারা দেবতাদেরকে সহচর ও পথপ্রদর্শক রূপে পায় এবং তাদের যোগ্য স্থানে তারা বাস করে।"

সক্রেটিস আরও বলেছেন : "মৃতদের মধ্যে যার চরিত্র মধ্যম শ্রেণীর ছিল, তার আত্মা Acheronএ তার জন্য প্রস্তুত তরণীতে আরোহন করবে। শাস্তি ভোগ করে পাপমুক্ত হবার পর সে স্নান করে তার সৎকার্যের গুণানুসারে সম্মান লাভ করবে। আর, যারা দেবতাকে উৎসর্গিত বস্তু অপহরণ, দস্যুতা, অন্যায় প্রাণীহত্যা ও ক্রমাগত ধর্মের বিধান স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করার মত মহাপাপে লিপ্ত থাকে, তারা Tartarus নামক এক ভয়াবহ স্থানে যাবে, যেখান থেকে তারা কখনও নিষ্কৃতি পাবে না। আর যারা জীবদ্দশাতেই তাদের দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ করেছে, যেমন মাতাপিতার প্রতি দুর্ব্যবহার, কিম্বা ভ্রমক্রমে প্রাণীহত্যার মত যাদের অপরাধ কিছুটা লঘু, তারা Tartarusএ নিক্ষিপ্ত

হয়ে পূর্ণ এক বৎসরকাল শাস্তিভোগ করবে। তারপর তরঙ্গমালা তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে ফেলবে যেখান থেকে তারা চীৎকার করে তাদের প্রতিপক্ষের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করতে থাকবে যাতে প্রতিঘাত ও শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। তারা যদি সম্মত হয়, তবে তারা মুক্তি পায়, নচেৎ পুনরায় তারা Tartarusএ প্রেরিত হয়। এইভাবে তাদের শাস্তিভোগ চলতে থাকে যতদিন না তাদের প্রতিপক্ষ তাদেরকে ক্ষমা করছে। আর যারা জীবনে পূতচরিত্র ছিল, তারা এই পৃথিবীতেই এইসব স্থান থেকে উদ্ধার পেয়ে যায়। বন্ধনদশা থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ তারা অনুভব করে। তারা নির্মল জগতে বাস করার অধিকারী হয়।"

Tartarus একটি বিরাট গভীর খাদ যার মধ্যে সমস্ত নদীস্রোত এসে পড়ে। প্রত্যেক জাতি তার নিজ নিজ অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী নরকে ভয়াবহতার কল্পনা করে থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলি প্রায়ই বন্যা ও জলপ্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে উপরের এই বর্ণনায় এমন স্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেখানে লেলিহান অগ্নিশিখা আছে। তবে মনে হয়, প্লেটো এখানে সমুদ্র বা সমুদ্রের কোনও আবর্ত (ডুরডুর) বোঝাতে চাইছেন।[১] এসব বর্ণনা যে সে সময়কার লোকের বিশ্বাসের প্রতিফলন, তাতে সন্দেহ নাই।

মোক্ষলাভের প্রকৃতি ও পন্থা

আত্মা পৃথিবীর সাথে আবদ্ধ যদি বিশেষ কারণ থেকে থাকে, তাহলে তার বিপরীত কারণ দ্বারাই আত্মার সে বন্ধন মোচন হতে পারে। আমরা পূর্বে বলেছি যে, ওদের মতে, এই বন্ধনের কারণ হচ্ছে অজ্ঞানতা, অতএব মোক্ষের উপায় হচ্ছে এমন সর্বব্যাপী, সূক্ষ্ম বিচারক্ষম জ্ঞান, যা ব্যাখ্যা বা যুক্তিতর্ক-নির্ভর নয় এবং যা সমস্ত সন্দেহকে বিদূরিত করে। সংজ্ঞা দ্বারা বস্তুকে জানার ফলে আত্মা নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং নিজের অমরতার মহিমা এবং ক্ষয়িষ্ণু ও পরিবর্তনশীল জড়দেহের হীনতা অনুভব করে। আত্মা তখন আর জড়ের প্রয়োজন বোধ করে না এবং উপলব্ধি করে যে, যা কিছু

---

(১) আরবী دردور শব্দের অর্থ—আবর্ত, Tartarus শব্দের pun রূপে এখানে প্রযুক্ত।

সে শ্রেয় ও আনন্দদায়ক বলে মনে করে এসেছে তা আসলে মন্দ ও দুঃখজনক। এইভাবে তার প্রজ্ঞালাভ হয় আর জড়দেহ ধারণ থেকে সে বিরত হয়। তার ফলে কর্মের অবসান ঘটে এবং আত্মা ও জড়ের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় সে মুক্তিলাভ করে।

'পাতঞ্জল' গ্রন্থের লেখক বলেছেন: ঈশ্বরের একত্ব ধ্যানকালে যে সব দৈনন্দিন ব্যাপারে মানুষ লিপ্ত থাকে তার বাইরের জগৎ তার মানসগোচর হয়। যে ঈশ্বরকে চায়, সে কোনও কারণ ব্যতিরেকেই সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গল চায়। আর একান্ত যে আত্মসর্বস্ব সে সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য শ্বাস প্রশ্বাসও গ্রহণ করে না। যখন মানুষ এই মানসিক অবস্থায় (ঈশ্বরানুরাগের দরুণ সমস্ত সৃষ্টির মঙ্গল কামনা) উপনীত হয়, তখন দৈহিক শক্তির উপর তার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাধান্য লাভ করে। তখন তার আট প্রকারের ক্ষমতা লাভ হয় যার দরুণ তার চিত্ত নিষ্কাম হয়। কারণ যা সাধ্যের অতীত তাকে ত্যাগ করা অসম্ভব।

সে আট প্রকারের শক্তি এই:

এক: দেহ এমন সূক্ষ্ম করা যা চক্ষে দেখা যায় না।

দুই: দেহকে এমন লঘু করা যার দরুণ চলাফেরার জন্য কাঁটা, কাদা বা বালুকার কোনও পার্থক্য সে অনুভব করে না।

তিন: নিজ দেহের আকার বৃদ্ধি করে ভয়ংকর রূপ ধারণ করা।

চার: নিজের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করার শক্তি অর্জন করা।

পাঁচ: ইচ্ছামাত্র সমস্ত কিছু জানতে পারা।

ছয়: ইচ্ছামত যে কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরু হওয়া।

সাত: সে সম্প্রদায়ের সকলকে তার প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল করে রাখা।

আট: মানুষ ও তার চরম লক্ষের ব্যবধান ঘুচে যাওয়া।

সাধক হওয়া ও পরমতত্ত্বলাভ করা সম্বন্ধে সুফীরা যা বলেন, তাও প্রায় এইরূপই দাঁড়ায়। তাঁদের মত যে তত্ত্ব-সাধকের দুইটি আত্মা থাকে; একটি চিরন্তন, যার কোনও পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটেনা, যার দরুণ সে

অজ্ঞেয়কে জানতে পারে এবং অলৌকিক কাজ করতে পারে। দ্বিতীয় আত্মাটি পরিবর্তন ও জন্ম-সাপেক্ষ বলে মানবীয়। এইরকম বিশ্বাসের সঙ্গে খৃষ্টানদের ধারণারও তেমন পার্থক্য নাই।

হিন্দুরা বলে: মানুষের যখন এইরূপ ক্ষমতা জন্মায়, তখন তার আর সে ক্ষমতা প্রয়োগ করবার স্পৃহা থাকে না। সে তখন জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরগুলি পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

স্তরগুলি এই:

১। সমুদয় বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও পার্থক্যের জ্ঞান। তখনও সংজ্ঞা নিরূপণের শক্তি তার হয় না।

২। বস্তুর প্রভেদ জ্ঞান থেকে, এমন সংজ্ঞানের উদয় যার দ্বারা বিশেষকে (particular) সার্বিকের (universal) অন্তর্গত করে গণনা করার ক্ষমতা জন্মায়, যদিও বিশেষের পার্থক্যবোধের প্রয়োজন তখনও থাকে।

৩। এই পার্থক্যবোধের বিলুপ্তি এবং সমুদয় বস্তুকে সামগ্রিক কিন্তু সময়ের নিয়মাধীনভাবে উপলব্ধি।

৪। চতুর্থ স্তরে তার এই উপলব্ধি কালের বন্ধনমুক্ত হয়। সে তখন নাম ও বিশেষণ ইত্যাদি যা কেবল মানবীয় প্রয়োজনের জন্য উদ্ভাবিত যন্ত্রস্বরূপ, সমস্তই ত্যাগ করে। এই স্তরে এসে সে বুদ্ধি (intellect), বুদ্ধ (intelligent), ও বোধির (intelligence) সাথে একীভূত হয়ে একাকার হয়ে যায়।

আত্মার মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে পাতঞ্জল যা বলেছেন, তা এই। এই মুক্তিকে হিন্দুদের ভাষায় মোক্ষ বলা হয় অর্থাৎ পরিণাম। সূর্য চন্দ্রের গ্রহণ শেষ হওয়াকেও ওরা মোক্ষ বলে থাকে, কারণ সূর্য চন্দ্র রাহুমুক্ত হবার মুহূর্ত্তে গ্রহণেরও অবসান হয়।

হিন্দুদের মতে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এ দুটি থেকে যে সুখানুভূতি উদ্ভব হয় তাও জ্ঞানসঞ্চয় করতে মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য। যেমন পানাহারে জিহ্বার স্বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে খাদ্য দ্বারা প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। তেমনই মৈথুনের সুখ জন্মের দ্বারা প্রজাতি (species)

রক্ষার সহায়তা করে ; যদি এই কর্মে কোনও সুখ না পাওয়া যেত তাহলে শুধু প্রজাতিরক্ষার জন্য মানুষ বা পশু কেউই এতে প্রবৃত্ত হোত না।

গীতায় উক্ত হয়েছে, "জ্ঞান সঞ্চয় করার জন্যই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু জ্ঞানলাভের উপায় চিরকালই এক প্রকার, সেহেতু মানুষকে একই প্রকারের জীবাঙ্গ দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি কর্মের জন্য সৃষ্টি হোত, তাহলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিন্ন প্রকারের হোত, কারণ মৌলিক ত্রিশক্তির পার্থক্যের দরুণ কর্মের পার্থক্য হয়। কিন্তু শরীরে জ্ঞানসঞ্চয়ের বিপরীত যা কিছু আছে, তার দরুণ দেহপ্রকৃতি কর্মের দিকেই ধাবিত হয়। ইন্দ্রিয়সুখ দিয়ে সে কর্মকে ঢাকা দিতে চায়, যদিও আসলে সে সুখ নয়, দুঃখ। জ্ঞান কিন্তু এই দেহপ্রকৃতিকে ভূপাতিত শত্রুর ন্যায় পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলে। সূর্য থেকে রাহু বা মেঘ যেমন অপসারিত হয়, তেমনই আত্মা থেকে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়।

এ কথা কয়টি সক্রেতিসের উক্তির মত। তিনি মনে করতেন যে, শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালে আত্মা কোনও বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হলে শরীর দ্বারা সে প্রতারিত হয়, কিন্তু চিন্তার ফলে তার অভীষ্টের কিছুটা তার কাছে স্পষ্ট হয়। তার সে চিন্তা এমন সময়ে হয় যখন সে শ্রবণ, দর্শন বা সুখদুঃখ ইত্যাদি দ্বারা বিরক্ত হয় না, যখন সে আত্মনিবিষ্ট থাকে এবং দেহ ও দেহের আনুসঙ্গিক সব কিছুকে সে সাধ্যমত পরিহার করে। দার্শনিকের আত্মা তখনই বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যখন সে দেহকে উপেক্ষা করে এবং তার থেকে বিচ্ছেদ চায়। ইহজীবনে যদি আমরা শরীরকে ব্যবহার না করি এবং একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত দৈহিক কোনও ব্যাপারে অংশগ্রহণ না করি এবং শারীরপ্রকৃতি যদি আমরা অর্জন না করি, বরঞ্চ তার থেকে নিষ্কলুষ থাকি, তাহলে আমরা দেহের অজ্ঞানতা থেকে বিরাম লাভ করে প্রজ্ঞার নিকটবর্তী হতে থাকব এবং ঈশ্বারানুমতিক্রমে আত্মদর্শন লাভ করে পরিশুদ্ধ হতে পারব। এই তত্ত্বকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের উচিত।

এখন আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে, অর্থাৎ গীতার উদ্ধৃতিতে ফিরে যাব।

"এইরকম অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানার্জনের কার্যে নিযুক্ত। জ্ঞানসাধক সে ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সুখ পায়, যেন এগুলি তার গুপ্তচর।

ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, সময়ের পার্থক্যানুযায়ী তাতে প্রভেদ থাকে। যে ইন্দ্রিয়গুলি হৃদয়ের সেবা করে, তারা কেবল উপস্থিত বা বর্তমান বিষয় বা বস্তুকেই অনুভব করে; হৃদয় বর্তমানকে উপলব্ধি করে এবং অতীতকে স্মরণ করে। 'প্রকৃতি' বর্তমানকে আয়ত্ত করে, অতীতেও সে বর্তমানকে নিজের জন্য দাবী করে, এবং ভবিষ্যতে তাকে পরাভূত করার জন্য প্রস্তুত হয়। বুদ্ধি কিন্তু সময় বা কাল-নিরপেক্ষভাবে বস্তুর মূল সত্তাকে জানতে পারে, এবং তার কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ সমান হয়ে যায় এই বুদ্ধির নিকটতম সহকারী হচ্ছে চিন্তা (বা ধ্যান) ও প্রকৃতি এবং দূরতম সহকারী হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় যখন জ্ঞানের কোনও বিষয়কে চিন্তার কাছে নিয়ে আসে, চিন্তা সে বিষয় বা বস্তুকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভ্রম-প্রমাদ থেকে নিষ্কলুষ করে এবং বুদ্ধির কাছে তাকে উপস্থিত করে। বুদ্ধি তখন তাকে বিশেষ (particular) থেকে সার্বিকে (universal) পরিণত করে এবং আত্মার গোচরীভূত করে। আত্মা এইভাবে জ্ঞানলাভ করে।"

হিন্দুরা মনে করে, মানুষ নিম্নলিখিত তিনটির যে কোনও একটি উপায়ে জ্ঞানী হতে পারে।

প্রথম: প্রেরণাদ্বারা, যা কোনও বিশেষ সময়ে লব্ধ নয়, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, মাতৃক্রোড়েই যা পাওয়া যায়। এর উদাহরণ 'কপিল', যিনি জ্ঞান ও বোধি নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়: কিছুকাল অতীত হওয়ার পর অনুপ্রাণিত হওয়া; যেমন ব্রহ্মার (براهم) সন্ততিরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর প্রেরণা পেয়েছিল।

তৃতীয়: কিছুকাল ব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা, অন্য সব লোকে যা করে থাকে, মন সুগঠিত হবার পর যারা শিক্ষিত হয়।

জ্ঞানমার্গে মোক্ষলাভ পাপ পরিহার না করলে সম্ভব নয়। এই পাপের নানা শাখা-প্রশাখা আছে; সেগুলিকে মোটামুটি লোভ, ক্রোধ ও মূঢ়তাতে বিভক্ত করা যায়। মূল কর্তন করলে শাখা-প্রশাখাগুলি নিজ হতেই শুকিয়ে যায়। এই পাপ দুটি প্রবৃত্তির প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে: ভোগ লিপ্সা ও ক্রোধ, যা মানুষের পরম শত্রু ও বিনাশকারী। কারণ, এ প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে ভোজনসুখে ও প্রতিহিংসার উল্লাসে প্রলুব্ধ করে, যা আসলে তাকে যন্ত্রণা ও দুষ্কর্মের দিকেই প্রায় ঠেলে দেয়। এই দুটি প্রবৃত্তি মানুষকে হিংস্র পশু ও জন্তু, এমন কি দানব ও দৈত্যের পর্যায়ভুক্ত করে দেয়।

মোক্ষলাভ করতে মানুষকে বিচারক্ষম বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হয়, যা তাকে যজ্ঞের দেবতার সমান করে দেয়। সাংসারিক কর্ম থেকে বিরত থাকাও মোক্ষলাভের আর একটি আবশ্যকীয় কর্তব্য। কিন্তু যতক্ষণ না এই কর্মের মূল কারণ লোভ ও অহঙ্কার দূর হয়, ততক্ষণ সে কর্ম থেকে নিরস্ত হতে পারে না। অতএব কর্ম থেকে বিরত হলেই উপরোক্ত লোভ-ক্রোধ-মূঢ়তার দ্বিতীয়টির মূলোচ্ছেদ হয়।

অবশ্য দুই উপায়ে কর্মের বিরতি ঘটে।

এক: তমোগুণের প্রভাবে আলস্য, বিলাস ও অজ্ঞতার দরুন। এ উপায় কাম্য নয়, কারণ এর পরিণাম দূষনীয়।

দুই: বিচার-বিবেচনার দ্বারা শ্রেষ্ঠতমকে বেছে নেওয়ার ফলে (prefer) যতক্ষণ না মানুষ সংসারের সব কিছু পরিহার করে নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কর্মত্যাগ সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন করে রাখলে বাহ্যবস্তু থেকে তার ইন্দ্রিয়কে সে এমনভাবে রুদ্ধ করতে পারে যে নিজকে ছাড়া অন্য কিছুর জ্ঞান তার থাকে না এবং তার সমস্ত গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারে। সবাই জানে, লোভী তার কাম্য বস্তু পাবার জন্য প্রয়াস করে। প্রয়াসের দরুণ তার কষ্ট হয়, আর কষ্ট হলেই সে হাঁপায়। অতএব এই শ্বাসকষ্ট লোভের ফল। এই লোভ দূর হলে তার নিঃশ্বাস জলচর জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসের মত হয়, সে বায়ুর প্রয়োজন অনুভব করে না। তখন তার হৃদয় কেবল মোক্ষের অন্বেষণে ও পরম (absolute) ঐক্যে উপনীত হতে একান্তভাবে নিবিষ্ট থাকে।

গীতাতে আরও আছে: "হৃদয়কে একান্তভাবে ঈশ্বরে নিযুক্ত না রেখে, তার সমস্ত কর্মকে একমাত্র ঈশ্বরে উদ্দিষ্ট না করে, নানা ক্ষেত্রে যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, সে মুক্তি কেমন করে পাবে? সমস্ত চিন্তা-ভাবনা যে সমস্ত বস্তু থেকে নিরস্ত করে পরম এককের প্রতি নিবদ্ধ রাখে, বাতাস থেকে সুরক্ষিত নির্মল তেলের প্রদীপশিখার মত তার হৃদয়ের জ্যোতি স্থির নিষ্কম্প থাকে। এই চিন্তায় সে এমন নিবিষ্ট হয়ে থাকে যে উষ্ণতা বা শীতের দরুণ কোনও কষ্টের অনুভূতি তার আর থাকে না, কারণ সে জানে যে সেই অদ্বিতীয় সত্য ব্যতীত অন্য সব কিছু ভ্রান্ত কল্পনা।"

এই গ্রন্থে আরও আছে: "দুঃখ বা সুখের কোনও প্রভাব সত্যলোকে পড়ে না, যেমন নদীর অবিরাম স্রোতোবেগের কোনও প্রভাব সমুদ্রের জলের উপর হয় না। লোভ ও ক্রোধকে নিষ্ক্রিয় ও মূলোৎপাটিত না করা পর্যন্ত কেমন করে কেউ এই গিরিপথে আরোহণ করবে?"

যে বিষয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম (অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে মোক্ষলাভ), তার জন্য অবিরত চিন্তা বা ধ্যান করা প্রয়োজন, যা সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায় না, কারণ সংখ্যা পুনরাবৃত্তি বাচক এবং পুনরাবৃত্তির অর্থ দুই আবৃত্তির মধ্যে ব্যবধান বা বিরতি, যা চিন্তার ও চিন্তেয়র ঐক্যে বাধা সৃষ্টি করে। অথচ আসল লক্ষ্য তা নয়, আসল লক্ষ্য হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন ধ্যান।

একই দেহে, কিম্বা বিভিন্ন দেহের মধ্যে দিয়ে ক্রমপর্যায়ে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। বাধ্যতামূলকভাবে সত্যাচরণ করে মানুষ তার আত্মাকে সত্যাচরণে এমন অভ্যস্ত করে যে সেই সত্যাচরণ তার প্রকৃতি ও মৌলিক গুণে পরিণত হয়।

ধর্মের বিধান পালন করাই সত্যাচরণ। এর মূল বিধানগুলি থেকে ওরা বহু সংবিধান (secondary rules) তৈরী করেছে। তবে মোটামুটি সে বিধানগুলিকে এই ভাবে ভাগ করা যায়।

(১) হত্যা না করা, (২) মিথ্যা না বলা, (৩) পরস্বাপহরণ না করা, (৪) পরস্ত্রীগমন না করা, (৫) ধনসঞ্চয় না করা এবং (৬) শুদ্ধাচার ও পবিত্রতা পালন করা, (৭) বিধিমত অবিরাম অনশন করা এবং অনাড়ম্বর বস্ত্র পরিধান করা, (৮) জপ ও আরাধনাসহ ভগবানের পূজায় অবিচলিত থাকা এবং উচ্চারণ না করে সৃজনধ্বনি 'ওম' মন্ত্রকে সদাসর্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখা।

জীবহত্যা না করার বিধানটি আসলে হিংসা ও অনিষ্টচিন্তা থেকে বিরত থাকার সাধারণ নীতির অংশবিশেষ। পরস্বাপহরণ ও মিথ্যাভাষণও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে; কর্মদুটির জঘন্যতা ও নীচতা উল্লেখ না করেও তা বলা যায়। ধনসঞ্চয় না করার অর্থ ক্লেশ পরিহার করা এবং ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাসস্থাপন করা, যার দরুণ পার্থিব সম্পদের হীন দাসত্ব

থেকে মুক্তির সম্মান লাভ করে পরম শান্তি পেতে পারে। তেমনই, শুচিতা রক্ষার বিধানের অর্থ শরীরের গ্লানি ও ক্লেদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, মালিন্যকে ঘৃণা করতে এবং শুদ্ধচিত্ততাকে ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া। দীন বস্ত্র পরিধান করে আত্মনিগ্রহের অর্থ, শরীরকে ক্ষীণ করা, তার দুষ্ট উত্তেজনাকে শান্ত করে ইন্দ্রিয়সমূহকে শোধন ও তীব্রতর করা। যেমন Pythagoras দেহ-চর্যারত ও দেহের বাসনাপূরণে উৎসাহী এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, "নিজের কারাগারকে সুদৃঢ় করতে ও নিজের শৃঙ্খলকে কঠিনতর করতে তোমার একটুও আলস্য দেখা যায় না।"

ঈশ্বর ও দেবতার ধ্যানে অবিচলিত নিষ্ঠা থেকে এদের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য জন্মায়। 'সাংখ্য' গ্রন্থে আছেঃ যেসব বস্তুকে মানুষ তার চরম লক্ষ্য মনে করে, সেগুলি অতিক্রম করতে সে পারে না। গীতাতে উক্ত হয়েছেঃ যেসব বিষয় নিয়ে মানুষ নিরন্তর চিন্তা ও আলোচনা করে, সেগুলি তার মনে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়; এমন কি, অবচেতনভাবে সেগুলির দ্বারা সে চালিত হতে থাকে। যেহেতু মৃত্যুকালে মানুষ তার প্রিয় বস্তুগুলি স্মরণ করে, দেহত্যাগের সময় আত্মা তার প্রিয় বস্তুর সাথে মিলিত হয় এবং তাতেই রূপান্তরিত হয়ে যায়।"

যেসব জীবের প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তন অবধারিত, তার সঙ্গে মিলন হওয়াই আত্মার প্রকৃত মোক্ষ নয়। এই মর্মে গীতায় উক্ত হয়েছেঃ "মৃত্যুকালে যে স্মরণ করে যে, ঈশ্বরই সব, তিনিই সমস্ত কিছুর কারণ—সে মুক্ত, যদিও তার স্থান সাধকদের নীচে।" গীতায় আরও আছে, "পৃথিবী থেকে মুক্তি চাইতে হলে পৃথিবীর সমস্ত ভ্রান্তি ও ছলনার সঙ্গ ত্যাগ কর, কর্মে ও যজ্ঞাদিতে সৎ উদ্দেশ্য রাখ, কোনও পুরস্কার বা প্রতিফলের আশা কোর না এবং মানুষ থেকে দূরে থাক।" শেষের এই কথাটির অর্থ এই যে তোমার বন্ধুকে তোমার শত্রু থেকে প্রিয় জ্ঞান করবে না; মানুষের জেগে থাকার সময়ে তুমি নিদ্রিত থেকে তাদের উপস্থিতির বৈপরীত্য কর; তাদের নিদ্রার সময়ে তুমি জেগে থাক; মানুষের মধ্যে উপস্থিত থেকেও তাদের সঙ্গ ত্যাগ করার এই-ই বিধি। আবার "আত্মাকে আত্মা থেকে রক্ষা কর, কারণ কামাসক্ত আত্মা পরম শত্রু, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পরম বন্ধু।"

তাঁর আসন্ন মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন না হয়ে বরং ভগবৎ মিলনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে Socrates বলেছিলেন : "তোমাদের কারুর চোখে আমার স্থান Apolloর Cyenusএর নীচে যেন না হয়," যার সম্বন্ধে বলা হয় যে, সে সূর্যদেবতা Apolloর পক্ষী (রাজহংস) এবং সেজন্য অদৃশ্য জগতের সংবাদ জানত, এবং যে মৃত্যু আসন্ন জেনে তার প্রভুর কাছে যাওয়ার আনন্দে সুললিত কণ্ঠে অবিশ্রাম গান করে যেত। "আমার ইষ্টপ্রভুর কাছে যাওয়ার আনন্দ অন্তত এই পক্ষীর আনন্দের চেয়ে কম নয়।"

এই কারণে সুফীরাও প্রেমের ব্যাখ্যা (সংজ্ঞা) দিতে গিয়ে বলেছেন, "প্রেমের অর্থ পরম সত্যকে ছেড়ে মানুষে নিবিষ্ট হওয়া।"

'পাতঞ্জল' গ্রন্থে আছে : "মোক্ষলাভের পথকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি। প্রথম : ক্রিয়া অভ্যাস করা। তার পন্থা হোল, দৃশ্যজগৎ থেকে ইন্দ্রিয়কে ফিরিয়ে অন্তর্জগতে এমনভাবে নিবিষ্ট করা, যার ফলে তোমরা নিজ সত্তাতে একান্তভাবে নিমগ্নচিত্ত থাকতে পার। জীবনধারণ যার উদ্দেশ্য তার জন্য এইটিই সাধারণ পথ।" বিষ্ণুধর্মে উক্ত হয়েছে : "ভৃগুবংশের রাজা পরীক্ষ (পরীক্ষিৎ) উপস্থিত ঋষিশ্রেষ্ঠ শতনিককে ঈশ্বরতত্ত্বের একটি বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে শতনিক সৌনক ও উষানগের মাধ্যমে ব্রহ্মার মুখ থেকে যা শুনেছিলেন, তা বল্লেন : "ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, যিনি অ-যোনীজ, যিনি এমন কিছু জন্ম দেন না যাকে তাঁর থেকে ভিন্ন বা অভিন্ন মনে করা সম্ভব। তাঁর সন্তুষ্টিতে কি পরম কল্যাণ, তাঁর ক্রোধে কি নিদারুণ অমঙ্গল, তা আমি কেমন করে বাক্যে প্রকাশ করি? সংসারবিমুখ হয়ে, তদগত ভগবৎ চিন্তাদ্বারা তাঁর উপযুক্ত পূজা করা ব্যতীত ঈশ্বরের তত্ত্ব কেমন করে জানা সম্ভব হবে?"

"প্রতিবাদে ব্রাহ্মণকে বলা হোলো : মানুষ দুর্বল, তার জীবন ক্ষণস্থায়ী, অকিঞ্চিৎকর, জীবনধারণের প্রয়োজনকে বর্জন করার মত মনের শক্তি তার নাই। সেজন্য তার পরিত্রাণের পথ বিঘ্নসঙ্কুল। মানুষ যদি আদিযুগের (সত্যযুগ) মত সহস্র বৎসর জীবিত থাকত এবং পৃথিবী তখনকার মত পাপশূন্য হোত, তাহলে অবশ্য সেরূপ কর্ম করতে পারার আশা থাকত। কিন্তু শেষ (কলি) যুগে, এই ঘূর্ণমান জগতে, তোমার মতে মানুষের জন্য কি এমন আছে, যার বলে সে সাগর লঙ্ঘন করবে, অথচ নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে?"

"তার উত্তরে ব্রহ্মা বল্লেন : অন্ন, আশ্রয় ও বস্ত্রের প্রয়োজন থেকে মানুষের পরিত্রাণ নাই, সেজন্য কিন্তু তার কোনও ক্ষতি হয় না। তবে এ সবের অতিরিক্ত বস্তু ও ক্লেশকর অনাবশ্যক কর্ম পরিহার ব্যতীত শান্তি আসতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরকেই তোমরা ভজন কর, তাঁকেই প্রণতি জানাও, তাঁর মন্দিরে সুগন্ধি ও ফুল দিয়ে তাঁর অর্চনা কর, তাঁর স্তোত্র পাঠ কর এবং তোমাদের হৃদয় তাঁতে নিবিষ্ট রাখ, যাতে সে কখনও অন্যমুখী না হয়। ব্রাহ্মণ ও অন্য সকলকে দান কর, তাঁর সমক্ষে মাংসাহার বর্জন বা উপবাস পালনের মত বিশেষ বা সাধারণ ব্রত গ্রহণ কর। ঈশ্বরের নামে পশু উৎসর্গ কর এবং সে পশুকে নিজের মত জ্ঞান করে তাকে হত্যা কোর না। জেনো যে তিনিই সব, অতএব তোমাদের সমস্ত কর্ম তাঁর জন্যেই সাধিত হওয়া উচিত। পৃথিবীর মিথ্যা সম্পদের কিছু যদি তোমাদের লাভ হয়, তা ভোগ করার সময়ে তাঁকে বিস্মৃত হয়ো না। সে সম্পদ-ভোগে যদি ভগবানকে তুষ্ট করা ও তাঁর আরাধনার সামর্থ্য-অর্জন যদি তোমাদের লক্ষ্য থাকে, তাহলে অন্য কিছু ব্যতিরেকেই তোমরা পরিত্রাণ লাভ করবে।"

'গীতা'তে বলা হয়েছে : "কামাদি রিপু যে সংহার করেছে, সে যা করতে বাধ্য, তার অতিরিক্ত কিছু করেনি। আর যে জীবন ধারণোপযোগী বস্তুসামগ্রীতেই সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য সে ধিক্কৃত বা নিন্দিত হবে না।"

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র আছে : "মানব প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী মানুষ তার প্রয়োজন থেকে যদি মুক্ত না হতে পারে, ক্লেশকর জঠরাগ্নি নির্বাপিত ও অঙ্গসঞ্চালনের বা শ্রান্তি দূর করতে যদি আহার, নিদ্রা ও শয্যার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে শয্যাটি পরিষ্কার ও মসৃণ হওয়া উচিত, ভূমি থেকে ঈষৎ উচ্চে অবস্থিত ও দেহ প্রসারিত করার মত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে যথেষ্ট হওয়া উচিত। নাতিশীতোষ্ণ স্থানে তার বাসস্থান হওয়া উচিত, যাতে শীত ও গ্রীষ্ম তার পক্ষে কষ্টকর না হয় এবং যেখানে সরীসৃপের উপদ্রব থেকে সে নিরাপদ থাকে। কারণ এগুলি হৃদয়-বৃত্তিকে শাণিত করতে সাহায্য করে, যাতে নির্বিঘ্নে সে ঐক্যের ধ্যান করতে পারে। কারণ অন্নবস্ত্রের অতিরিক্ত যা কিছুর অভাব মানুষ বোধ করে, আপাতত সুখদায়ক হলেও আসলে তা কষ্টেরই ছদ্মরূপ। তাতে মগ্ন থাকা অনিষ্টকর, কঠিনতম যন্ত্রণা যার পরিণাম। প্রকৃত সুখী সেই, যে কাম ক্রোধ নামক দুই প্রতিবন্ধকরূপী

শত্রুকে তার জীবদ্দশাতেই নিহত করেছে, যে বহির্জগতে শান্তির আশা না করে নিজ অন্তর থেকেই শান্তিলাভ করতে চায় এবং যে তার ফলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন অনুভব করে না।"

অর্জুনকে বাসুদেব বলেছিলেন : "যদি তুমি অবিমিশ্র কল্যাণ চাও, তাহলে শরীরের যে নয়টি দ্বার আছে, তার প্রহরা দাও ও তার মধ্যে দিয়ে গমনাগমনকারীর সন্ধান রাখ ; অন্তরের চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত হতে দিও না ; নিজ মনকে নবজাত শিশুর মস্তিষ্কের কথা স্মরণ করে শান্ত কর, যা প্রথমে অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দ্বারা ঢাকা থাকে এবং পরে এই কোমল আবরণ কঠিনতা লাভ করে মস্তিষ্কের স্পর্শ-কাতরতা বন্ধ করে দেয় ; যেন, কোন বাহ্য প্রভাবের তার আর প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বই আর কিছু নয় ; সেজন্য সেই অনুভূতির দ্বারা চালিত হোয়ো না।"

২। মোক্ষলাভের পথের দ্বিতীয় ভাগ হোল, সন্ন্যাস, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বস্তুজগৎ ও নশ্বরদেহের কুপরিণাম-উপলব্ধিজনিত তৎপ্রতি ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্য। তার দরুন মনে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং এই বস্তুজগতের প্রতি লোভের অবসান হয়, আর এইভাবে যে মূল ত্রিশক্তি, অর্থাৎ সত্য, রজঃ, তম, ও কর্মবৈচিত্র্যের কারণ, তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আসে। পৃথিবীকে যে সম্পূর্ণ করে জেনেছে সে জানে যে পার্থিব কল্যাণ আসলে অকল্যাণ। পৃথিবীর সুখ পরিণামে নিদারুণ কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, যা তাকে পৃথিবীর সঙ্গে জড়াতে চায় এবং যার দরুন পৃথিবীতে তাকে বেশীদিন বাস করতে হয়, তার সবই সে পরিহার করে চলে।

'গীতা'তে আছে : "কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয়ে মানুষ ভ্রমে পতিত হয়, কর্মের ভাল মন্দ নির্ণয় করার কোনও আদর্শ তার সম্মুখে নাই, কাজেই কর্ম ত্যাগ করা এবং কর্মের সাথে অসম্পৃক্ত থাকাই প্রকৃত কর্ম।"

এই গ্রন্থে আরও আছে ; "জ্ঞানের পবিত্রতা অন্যসব বস্তুর পবিত্রতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা জ্ঞান-অজ্ঞানতা দূর করে এবং নিশ্চিত প্রত্যয় দ্বারা সংশয় নাশ করে ; সংশয়ের দরুনই কষ্ট হয়, সেজন্য সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তি কখনও শান্তি পায় না।"

এখন দেখা যাচ্ছে যে মোক্ষপথের প্রথম পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের উপায় মাত্র।

৩। তেমনই তৃতীয় পর্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রস্বরূপ। এই পর্যায় হচ্ছে ঈশ্বরারাধনা, যেন তিনি মানুষকে পরিত্রাণলাভের সামর্থ্যদান করেন এবং তাঁর কৃপায় মানুষের এমন দেহে পুনর্জন্ম হয়, যাতে পরম সুখের দিকে (মোক্ষের) সে ক্রমাগত অগ্রসর হতে পারে।

'গীতা'কার ভগবৎপূজাকে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই তিন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করেছেন। উপবাসপালন, শাস্ত্রবিধান-অনুসরণ, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা, দেহের সুচিতারক্ষা, অহিংসা, পরস্ত্রী ও পরাধনে অনাসক্তি—এইগুলি কায়িক আরাধনার অন্তর্ভুক্ত। বাচনিক পূজার অর্থ বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, নামোচ্চারণ, সত্যভাষণ, সকলের সঙ্গে নম্রভাবে কথোপকথন এবং মানুষকে সততা ও সৎকার্য করতে উপদেশ দেওয়া। আর মনের আরাধনা হোল উদ্দেশ্যের সরলতা ও সততা, দণ্ড পরিহার, ধৈর্যধারণ ও ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ, আর তার সঙ্গে উদার ও নির্মল অন্তঃকরণ। মোক্ষলাভের পথের এই তিন ভাগের সাথে গ্রন্থকার আর একটি অলীক ও ভ্রান্ত চতুর্থ প্রক্রিয়া যোগ করে দিয়েছেন। এর নাম রসায়ন, অর্থাৎ ঔষধপ্রয়োগে কিমিয়া বিদ্যার মত অসম্ভবকে সম্ভব করা। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। আসলে অভীষ্টের প্রতি অটল বিশ্বাস, লক্ষ্যসাধনে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও চেষ্টার ঐকান্তিকতার ক্ষেত্র ছাড়া মোক্ষতত্ত্বের সাথে এই রসায়ন বিদ্যার অন্য কোথাও যোগ নাই।

ওদের বিশ্বাসমতে, পরিত্রাণ বা মোক্ষের অর্থ ভগবানে লীন হওয়া ; কারণ, ঈশ্বর প্রতিদানের আশা বা প্রতিফলের শঙ্কা থেকে চিরমুক্ত, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁর জ্ঞান সময়াপেক্ষিক বা আকস্মিক নয়। প্রত্যেক বিষয় বা বস্তুর প্রতিটি মূহূর্ত তাঁর জ্ঞানের মধ্যে বিধৃত।

এই বিশেষণগুলি ওরা কৈবল্যপ্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধেও প্রয়োগ করে থাকে। ঈশ্বরের সাথে সে আত্মার যে পার্থক্য তা কেবল উৎপত্তির ব্যাপারে, কারণ তার অস্তিত্ব অনাদিকাল থেকে নয়। আর একটি প্রভেদ এই যে, নিষ্কৃতির পূর্বে যে পৃথিবীর মায়াজালের মধ্যে বাস করত, তাকে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞানলাভ

করতে হোত এবং বহু চেষ্টাপ্রসূত হওয়া সত্ত্বেও সে জ্ঞান ছায়ামাত্র হোত, কারণ আসলে জ্ঞেয় বস্তু আবরণের আড়ালেই থেকে যেত। কিন্তু নিষ্কৃতির জগতে সমস্ত আবরণ অপসৃত হয়, সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, সমস্ত বাধা বিদূরিত হয়। এবং ইন্দ্রিয়াদির দূষিত অনুভূতির দ্বারা আবৃত কোনও অজ্ঞাত বিষয়কে জানার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই সত্তা প্রজ্ঞাশীল থাকে এবং চিরন্তন তত্ত্বের সাথে একীভূত হয়ে যায়।

এইজন্য, 'পাতঞ্জল' গ্রন্থের উপসংহারে শিষ্য 'মোক্ষের' প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে গুরু উত্তরে বলছেন: "তুমি বলতে পার যে সত্য-রজঃ-তম, এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার এবং এই গুণত্রয়ের নিজ উৎসে ফিরে যাওয়ার নামই মোক্ষ। অন্যভাবে এও বলা চলে যে, পরম জ্ঞানী হয়ে আত্মার নিজ প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়ার নামই মোক্ষলাভ।"

মোক্ষের স্তরে উপনীত আত্মা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদও হয়েছে। সাংখ্য গ্রন্থে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করছেন: "কর্মের অবসান হলেই মৃত্যু হয় না কেন?" ঋষি উত্তর দিলেন: "এইজন্য সে জীবসত্তার এক বিশেষ অবস্থার দরুনই বিচ্ছেদ বা মৃত্যু ঘটে, কিন্তু তখনও আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয় না। দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই ঘটে, কিন্তু কারণ দূর হওয়ার পরও কারণের প্রভাব কিছুকাল পর্যন্ত প্রায়ই থাকে। এই প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে এবং অবশেষে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। রেশমের সুতা প্রস্তুতকালে তাঁতি তার চাকার ঘূর্ণিবেগ বাড়িয়ে নেওয়ার পর কাষ্ঠখণ্ড সরিয়ে নিলেই যেমন চাকাটির ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায় না, বরঞ্চ একটু করে কমে তবে বন্ধ হয়, তেমনই কর্মাবসানের পরও গতি ও স্থৈর্যের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে যাবার ফলে বাহ্যশক্তির প্রভাব ও পূর্বাবস্থার রেশ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দেহে কর্মের প্রভাব থাকে।"

'পাতঞ্জল' গ্রন্থেও অবশ্য এই রকম উক্তি আছে: ত্রস্ত কূর্ম যেমন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজদেহে গোপন করে নেয়, তেমনই ইন্দ্রিয় দমনকারী মানুষের কথা বলতে গিয়ে পাতঞ্জল বলেছেন: "এই ব্যক্তি শৃঙ্খলমুক্ত, কারণ তার বন্ধন শিথিল হয়েছে; কিন্তু তার মুক্তি হয় নি, কেননা সে এখনও দেহ বিমুক্ত হয়নি।"

এই গ্রন্থের অন্যত্র আবার এই মতের বিপরীত কথাও আছে, যেমন, "প্রতিফল আকর্ষণ করার জন্য শরীরগুলি আত্মার ফাঁদ বিশেষ। যে মোক্ষলাভ করেছে, সে তার বর্তমান দেহে অতীতের সমস্ত কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়ে গেছে; ভবিষ্যৎ প্রতিফলের অধিকার অর্জনের জন্য সে তখন আর প্রয়াস করে না। সে তখন এই ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়; দেহাবয়বের সে আর প্রয়োজন বোধ করে না এবং দেহের মায়ায় জড়িত না হয়ে সচ্ছন্দে তার মধ্যে বিচরণ করে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবার তার সামর্থ্য হয়, এমন কি সে মৃত্যুর ঊর্ধ্বেও উঠতে পারে। কারণ কোনও স্থূল বস্তুই তার দেহকে বাধা দিতে পারে না। সে অবস্থায় তার আত্মাকে দেহ কেমন করে বাধা দেবে?"

সুফীরাও প্রায় এইরকম মতই পোষণ করেন। তাদের গ্রন্থে কোনও একজন সুফী-বর্ণিত এই ঘটনা লেখা আছে: "একদল সুফী আমাদের কাছে এসে উপনীত হলেন এবং আমাদের থেকে কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করলেন। তাদের মধ্যে একজন নামাজ পড়তে উঠলেন। নামাজ শেষ করে আমার দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন: 'সুধী, এখানে এমন কোনও স্থান আপনি জানেন কি যেখানে আমি দেহ রক্ষা করতে পারি?' আমরা মনে করলাম যে, তিনি ঘুমাতে চান, তাই তাঁকে একটি স্থান দেখিয়ে দিলাম। তিনি সেখানে গেলেন এবং দেহ বিস্তৃত করে স্থির হয়ে রইলেন। একটু পরে আমরা কাছে গিয়ে তাঁকে নাড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তখন তাঁর দেহ শীতল হয়ে গেছে।"

"আমরা তার জন্য পৃথিবীতে স্থান করে দিয়েছি"—আল্লাহ্‌র এই বাণীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সুফীরা বলেছেন: "আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবী তাঁর জন্য নিজকে গুটিয়ে নেবে; জল ও বায়ু স্তম্ভিত হয়ে তার ওপর দিয়ে তাকে চলতে সক্ষম করবে; এবং তার গমনপথে পর্বতের উচ্চতা বা জড়তা লুপ্ত হয়ে যাবে।"

আবার চেষ্টা সত্ত্বেও কেউ কেউ মোক্ষলাভের যোগ্য হয় না; এই অবস্থার স্তরভেদ আছে। 'সাংখ্যে' উক্ত হয়েছে: সদাচরণ, নিজ বিত্তের অকৃপণ সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিয়ে যে পৃথিবীতে বাস করে সে এইভাবে পুরস্কার পায় যে, তার সাধ-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় এবং দৈহিক ও মানসিক স্ফূর্তিতে সে পৃথিবীতে বিচরণ করে। পূর্বজন্মে বা ইহজন্মে কৃতকর্মের পুরস্কারই হোল সম্পদের আসল

অর্থ। নির্জ্ঞান হয়েও যে পৃথিবীতে সাধুর মত জীবন যাপন করে উন্নীত ও পুরস্কৃত হবে। কিন্তু সাধনমন্ত্রের অভাবে তার মোক্ষলাভ হবে না। আর যে পূর্বোক্ত অষ্টশক্তিলাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে এবং তার সফল প্রয়োগে গর্বিত হয়ে তাকেই মোক্ষ মনে করে, এই অবস্থা থেকে তার উন্নতি হবে না।"

তত্ত্বজ্ঞান-সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রমণে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে একটি উপমা প্রয়োগ করা হয়। কোনও কর্মোপলক্ষে শিষ্যমণ্ডলীসহ একটি লোক শেষরাত্রে যাত্রা করেছে। পথিমধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় একটি মনুষ্যমূর্তি চোখে পড়ল, অন্ধকারের জন্য যাকে ভালভাবে চেনা যায় না। লোকটি তার শিষ্যদের প্রত্যেককে এই ছায়ামূর্তিটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। একজন বলল, এটি কী বস্তু আমি জানি না। দ্বিতীয় জন বলল, এটি কি, তা ত জানিই না, জানার উপায়ও আমার জানা নাই। তৃতীয় শিষ্য বলল, এখনই এর অনুসন্ধান করে কি হবে? কিছুক্ষণের মধ্যে প্রভাত হলেই সব প্রকাশ হয়ে যাবে, যদি ভূত-প্রেত কিছু হয় তা হলে ঊষালোকেই সরে যাবে, আর যদি অন্য কিছু হয়, তাও জানা যাবে।"

এই তিনজনের কেউই জ্ঞানলাভ করে নি। প্রথমটি তার মূর্খতার জন্য। দ্বিতীয়টি তার ক্ষমতা ও বুদ্ধির অভাবে, আর তৃতীয়টি তার আলস্য ও অজ্ঞানতায় সন্তুষ্ট থাকার জন্য। চতুর্থ শিষ্য কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ না করে উত্তর দিতে চাইল না। সে নিকটে গিয়ে দেখে যে মূর্তিটি আর কিছু নয়, লতাগুল্ম আবৃত একটি অলাবু মাত্র। সে জানে, জীবন্ত স্বেচ্ছাধীন মানুষ মাথায় এইরূপ কিছু জড়িয়ে না গেলে কখনও একস্থানে স্থির হয়ে থাকে না। তখন সে বুঝতে পারল, মূর্তিটি লম্বাভাবে অবস্থিত একটি জড়পদার্থ। বস্তুটি গোময়ের কোন আবৃত স্তূপ কিনা জানবার জন্য সে নিকটে গিয়ে তাতে পদাঘাত করল, তাতে অলাবুটি মাটিতে পড়ে গেল। তার সমস্ত সন্দেহ এইভাবে দূর হোল। গুরুর নিকটে ফিরে গিয়ে সে বস্তুটির সঠিক বর্ণনা দিল। গুরু এইভাবে শিষ্যের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করল।

প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে Ammoniusএর রচনায় Pythagorus থেকে উদ্ধৃত উক্তিতে এই মতের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। "যাতে তুমি চিরস্থায়ী হতে পার, সেজন্য ইহজগতে তোমার সমস্ত কামনা ও কর্মপ্রয়াস সেই আদি কারণের

সাথে মিলনের জন্যই হওয়া উচিত; সে তোমার সকল কারণের কারণ। তার দরুন তুমি ক্ষয় ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পাবে, সত্যানুভূতি ও প্রকৃত আনন্দলোকে যেতে পারবে, এবং অনন্ত সুখভোগের পরম সম্মানলাভ করবে।"

Pythagorus আরও বলছেন: "দেহরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে নির্লিপ্ততা আশা কেমন করে করো? দেহদ্বারা শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুক্তির আশাই বা কেমন করে করো?"

Ammonius বলেছেন: "Empedocles ও Heracles প্রমুখ তাঁর পূর্বসূরীদের মত ছিল যে বিশ্বজনীন আত্মার সাহায্য চাওয়া পর্যন্ত মলিন আত্মা সর্বদাই পৃথিবীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। সাহায্য চাওয়ার পর বিশ্ব-আত্মা বোধির কাছে তার হয়ে সুপারিশ করে; বোধি আবার স্রষ্টার কাছে অনুরোধ জানায়। স্রষ্টা তখন নিজ জ্যোতির অংশ বোধিকে দেন, বোধি সেই জ্যোতি দিয়ে বিশ্বের অন্তর্নিহিত সামগ্রিক আত্মাকে আশীর্বাদ করে। জীবাত্মা সেই জ্যোতির আলোকে সামগ্রিক আত্মাকে উপলব্ধি করতে, তার সাথে মিলিত হয়ে, তার সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে চায়। এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কিন্তু বহু যুগের প্রয়োজন। তখন আত্মা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে উপনীত হয়, যেখানে জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ বা দুঃখ পৌঁছায় না।"

Socrates বলেছেন: "স্থানের বন্ধন ত্যাগ করার সময়ে জীবাত্মা স্বভাবতই চিরন্তন পবিত্রতার দিকে যাত্রা করে। স্থায়িত্বে আত্মাও তখন এই পবিত্রতার সাদৃশ্যলাভ করে; কারণ সংস্পর্শের ফলে তার পবিত্রতার প্রভাব তার উপরে পড়ে। এই প্রভাব গ্রহণকেই বোধি বলা হয়।"

তিনি আরও বলেছেন: "আত্মা অনেকটা ভগবৎ সত্তার অনুরূপ যার মৃত্যু বা ক্ষয় হয় না, যা বোধির একমাত্র বিষয় এবং যা চিরন্তন। আত্মা তার বিপরীত। আত্মা ও দেহ যখন মিলিত হয়, তখন প্রকৃতি দেহকে সেবা করতে আর আত্মাকে শাসন করতে আদেশ দেয়। যখন তারা বিযুক্ত হয়, আত্মা ও দেহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যায়। আত্মা সেখানে তার উপযোগী বস্তু পেয়ে সন্তুষ্ট হয়, স্থানের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, ভ্রান্তি, শোক, আসক্তি, ভয়

প্রভৃতি মানবীয় দোষ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শান্তিলাভ করে। অবশ্য শুদ্ধচিত্ত ও দেহের প্রতি ঘৃণা থাকলেই এ অবস্থা পাওয়া যেতে পারে। দেহকে প্রিয় জ্ঞান করে সে তার পরিচর্যা ও আসক্তির দ্বারা যদি নিজকে কলুষিত করে যাকে, যার ফলে দেহ তার কামনা ও সুখানুভূতির দাস হয়ে পড়ে, তাহলে শারীরবস্তু ও তার সঙ্গে সংস্পর্শের অতিরিক্ত অন্য কোনও সত্যের অভিজ্ঞতা সে আত্মার হয় না।"

Proclus বলেছেন: "চৈতন্যময় আত্মা যে পদার্থে বাস করে, তাকে ভূ-গোলকের আকার দেওয়া হয়; যেমন ইথর ও তার প্রাণীসমূহ। আর যাতে চৈতন্যময় ও অচৈতন্য আত্মা থাকে, তার আকার মানুষের ন্যায় খাড়া। যাতে শুধুমাত্র অচৈতন্য আত্মা থাকে, তার আকার চিন্তাশক্তিহীন পশুদের ন্যায় খাড়া ও ন্যুব্জ। যেসব দেহে এ দুটি গুণের কোনটিই নাই, যাতে কেবল খাদ্যগ্রহণ ছাড়া অন্য শক্তি নাই, তার আকার খাড়া বটে কিন্তু ন্যুব্জ ও নিম্নমুখী, তার শিরঃদেশ মৃত্তিকায় প্রোথিত, যেমন লতা ও বৃক্ষাদি। এই শেষোক্ত অবস্থা মানুষের অবস্থার বিপরীত। সেজন্য মানুষ স্বর্গীয় বৃক্ষ, যার মূল তার উৎস অর্থাৎ স্বর্গের দিকে প্রসারিত; আর বৃক্ষাদির মূল তার উৎসের দিকে অর্থাৎ মৃত্তিকার দিকে প্রসারিত।"

হিন্দুরা প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরকম মত পোষণ করে। অর্জুন প্রশ্ন করেন: "জগতের কোন্ বস্তুর সাথে ব্রাহ্মণের সাদৃশ্য আছে?" বাসুদেব বললেন: "তাকে অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় কল্পনা কর।" এই অশ্বত্থ ভারতবর্ষের অতি সুপরিচিত বৃক্ষ; এও নিম্নমুখী অর্থাৎ এর শিকড় ঊর্ধ্বে, শাখা-প্রশাখা নিম্নে থাকে। রস পেলে বৃক্ষটি বিরাটাকার ধারণ করে, তার শাখা বিস্তৃত হয়ে মৃত্তিকা স্পর্শ করে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করে। তখন উপরের শিকড় ও নিম্নের শাখা এমন সমান দেখায় যে তাদের প্রভেদ বোঝা যায় না। ব্রাহ্মণ এই বৃক্ষের উপরকার শিকড়, বেদ তার কাণ্ড, বিভিন্ন মত ও ধর্মসম্প্রদায় তার শাখা-প্রশাখা, আর ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদি তার পত্রসমূহ। ত্রিগুণ থেকে তার আহার্য সংগ্রহ হয় আর ইন্দ্রিয়াদি থেকে বৃক্ষের স্থিতি ও দৃঢ়তা আসে। এই বৃক্ষকে কর্তন করা অর্থাৎ পৃথিবী ও তার বিভ্রম পরিত্যাগ করা অপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তির তীব্রতর কোন বাসনা নাই।

বৃক্ষটিকে কর্তন করার পর তার মূলে সে বাস করতে চায়, যেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন (বা জন্মান্তর) নাই। যখন তার এই মনস্কামনা পূর্ণ হয়, সে তখন উষ্ণ ও শীতের সমস্ত কষ্ট পিছনে ফেলে আসে এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির আলোক অতিক্রম করে সে ঈশ্বরের জ্যোতি লোভ করে।"

পাতঞ্জলের মতের সঙ্গে ঈশ্বর-সাধনা-সংক্রান্ত সুফীদের উক্তির মিল আছে। সুফীরা বলেন: যতক্ষণ তুমি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে নির্দিষ্ট থাক, ততক্ষণ তুমি অদ্বৈতবাদী হতে পার না। সত্যস্বরূপ যখন তোমার এই লক্ষ্যবস্তুকে করায়ত্ত করে তার বিলুপ্তি ঘটান, তখন লক্ষ্যও থাকে না, লক্ষ্যবস্তুও থাকে না (সব একাকার সত্যময় হয়ে যায়)।

সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)-এর সমর্থক মতও সুফীদের উক্তিতে পাওয়া যায়। যেমন, সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে একজন বলেছিলেন: "যিনি প্রকৃত সত্তায় "আমি" এবং যিনি শূন্যে "আমি-নয়", তাকে কেন আমি চিনব না? যদি পুনরায় আমি পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করি, তাহলে প্রত্যাগমনের দরুন তার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হই আর যদি পৃথিবী থেকে পরিত্যক্ত হই তাহলে পরিত্যক্ত হওয়ার দরুন আমি ভারশূন্য হই, এবং তার সঙ্গে মিলনে অভ্যস্ত ও অনুরক্ত হই।"

আবুবকর শিবলি যেমন বলেছেন: "সমস্ত কিছু ত্যাগ কর, তাহলে আমাকে সম্পূর্ণভাবে পাবে। তুমি বর্তমান থাকবে, কিন্তু আমা ভিন্ন তোমার কোনও পরিচয় থাকবে না, এবং তোমার কর্ম আমারই কর্ম হবে।"

বায়েজীদ বিস্তামীকে প্রশ্ন করা হয়: "আপনি যে শক্তি বা মর্যাদা লাভ করেছেন, তা কেমন করে পেলেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "সর্প যেমন তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি আমার আমিত্ব থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি। তখন নিজ সত্তাকে অনুধাবন করে দেখলাম যে, আমিই তিনি।"

"আমরা তখন বল্লাম: মৃত গাভীর কোনও অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত কর"—কোরাণের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সুফীরা এই প্রকারে করেন যে, জীবিত

করার উদ্দেশ্যে মৃতকে নিহত করার অর্থ, দেহের মৃত্যু না হলে আত্মা জ্ঞানের আলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত হয় না, যতক্ষণ না কঠোর তপশ্চর্যার ফলে দেহের এমনভাবে মৃত্যু ঘটে যে, তার অস্তিত্ব নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং তোমার আত্মাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায় যার উপরে নিয়মাধীন জগতের কোনও প্রভাব পড়ে না।"

সুফীরা আরও বলেন: "মানুষ ও আল্লার মধ্যে আলোক ও আঁধারের সহস্র স্তর আছে। মানবজাতি অন্ধকার ভেদ করে আলোর দিকে অগ্রসর হতে প্রয়াস পায়। আলোকে উপনীত হবার পর তাদের আর প্রত্যাবর্তন হয় না।"